একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ এই আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়। শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রথমেই প্রতিবাদ মুখর হয়। তারা অন্যায় বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং অনেকে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দেয়। যার প্রেরণায় দীর্ঘ সংগ্রামের পর জন্ম নেয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি-বাংলাদেশ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করতে পারব;
- নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করতে পারব;
- ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আগ্রহী হব;
- রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাব বিনিময়ে উৎসাহী হব এবং অপরকেও উৎসাহী করব।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল নেই। প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধানের পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দুইটি ভূখণ্ডকে এক করা হয় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই। সে সময় মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত দেন। তখনই ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী, লেখকগণ এর প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গ বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। সব কিছুকে উপেক্ষা করে ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করে।

১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ২৩এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু, মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। ২৬ ও ২৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২রা মার্চ দেশের ছাত্রসমাজ বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মতো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এবার আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহ্বানে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল করার সময় পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকে আহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩-১৫ই মার্চ আবার ধর্মঘট পালিত হয়। এবার শুধু ঢাকা নয়, দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৫ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৮ সালের ১৯ই মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১এ মার্চ রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪এ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেন। দুটি বক্তব্যেই তিনি বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে 'না না' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদ করেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ চলতে থাকে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যে জিন্নাহ্‌র কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা হয়।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০এ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। ৩১এ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসময় হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ করেন। সরকারি এ ঘোষণা পাওয়া মাত্রই ঢাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা কিছুতেই ১৪৪ ধারা মেনে নিতে পারেনি।

২০এ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এ সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে দ্বিমত দেখা দেয়। অধিকাংশ সদস্য প্রথমে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু, আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে যোগ দেয়। কতিপয় নেতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করে। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

ছাত্র-ছাত্রীরাও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল শহিদ হন। সে সময় গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২এ ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যেস্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয় সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩এ ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদমিনার নির্মাণ করে। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

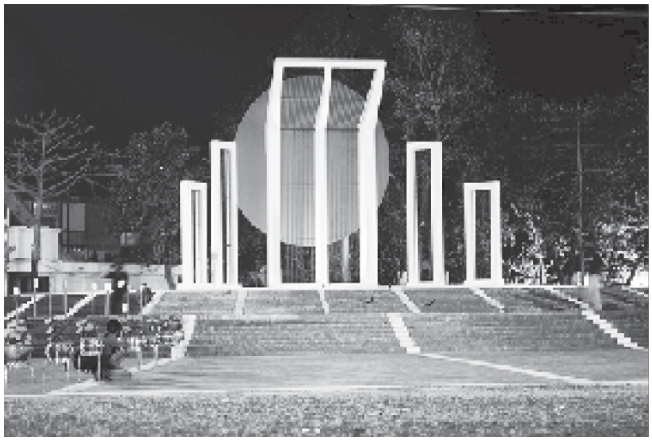

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

তারপরেও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের একপর্যায়ে এর সদস্য আদেলউদ্দিন আহমদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিল পাস করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনে নারী

আটচল্লিশ ও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন এদেশের নারী সমাজের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মিছিলে, শ্লোগানে, সভাসমিতিতে তারাও পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন।

ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজ ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। মিছিল মিটিং-এ উপস্থিত থেকে নাদিরা চৌধুরীসহ আরও অনেকে পোস্টার, ফেস্টুন লিখনসহ এবং নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

ঢাকার বাইরেও নারী সমাজের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। যশোরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হামিদা রহমান। বগুড়ার বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন সহ অনেকে। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের ও ব্যাপক ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গায় যাঁরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহিমসহ অনেকে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম গ্রেফতার হলে পুলিশ-জনতার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর একুশে দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। একুশের প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে এই দিনটি সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

একক কাজ ঃ

১। ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

২। শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলার কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

রাজনৈতিক তৎপরতা

১৯৪৭ সালে বাংলার বিদ্যমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব বাংলায় প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল বা ধারা বিদ্যমান ছিল। ১. ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ, ২. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ধারার দল জাতীয় কংগ্রেস, ৩. বিপ্লবী সাম্যবাদী ধারার কমিউনিস্ট পার্টি।

মুসলিম লীগ ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নতুন নামকরণ হয় পাকিস্তান মুসলিম লীগ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসক দল হিসেবে মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু। শুরু থেকেই উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গের পকেট দলে পরিণত হয় মুসলিম লীগ। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ ভুলে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ নেতারা বাঙালির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, বাঙালির প্রতি চালায় দমননীতি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিমদের মতো মুসলিম লীগের ত্যাগী বাঙালি নেতারা উপেক্ষিত হন। শাসকদল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে।

১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এসময় দলটি। একটি ধারা ছিল সোহরাওয়ার্দি-হাশিমপন্থী, অন্যটি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন-আকরাম খাঁপন্থী। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক, সংস্কারপন্থী এবং দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ দোসর। ফলে এ আন্তকোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংস্কারপন্থী ধারার নেতাদের সবসময় কোণঠাসা এবং দমন করার চেষ্টা করত।

মুসলিম লীগের এই ভ্রান্তনীতির কারণে দেশে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার উন্নতির দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত করত না। পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমেই প্রকট হতে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি- প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বৈষম্য ছিল লক্ষণীয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন দ্রুত কমতে থাকে।

নতুন নতুন রাজনৈতিক দল

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগেরই অনেক নেতা মর্মাহত হন। মুসলিম লীগের বিরোধী পক্ষরা রাজনৈতিক দল গঠনে এগিয়ে আসেন। এসময় পূর্বের কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও পিপলস ফ্রিডম লীগ, গণ আজাদী লীগ, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, নেজামে ইসলাম, খিলাফত-ই-রাব্বানি পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। তবে সবচেয়ে বড় পটপরিবর্তন ছিল খোদ মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন। বাংলার মুসলিম লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা মুসলিম লীগ ত্যাগ করে গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলায় মুসলিম লীগবিরোধী এক বা একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ

দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংস্কারপন্থী ছিল তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন নিপীড়ন চালাতে থাকে। দেশ শাসনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বঞ্চিত নেতাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেকে মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দি একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথেও নতুন দল গঠন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। নতুন দল গঠনের তৎপরতা ও প্রস্তুতির পর ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪এ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। ৩০০ জন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকার আরমানিটোলায় ২৪এ জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময়ে তাদের প্রধান দাবির মধ্যে ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, একজনের এক ভোট, গণতন্ত্র, একটি সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। বাংলার ইতিহাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রথম সফল বিরোধী দল। এ দলটি গঠনের মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতিতে যে শূন্যতা ছিল তা পূরণ হয়। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কুশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে অচিরেই দলটি জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এরপর মুসলিম লীগ একটি নামসর্বস্ব দলে পরিণত হয়।

জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে 'ছয় দফা' দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃতই আওয়ামী বা জনগণের দলে পরিণত হয়। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই আওয়ামী লীগের হাতে চলে আসে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। পূর্ব থেকেই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় নানা টালবাহানা করে নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। অবশেষে সরকার পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং ৪. হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রণীত এই ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা।

৩. পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৫. লবণের কারখানা স্থাপন করা।

৬. মোহাজের-শিল্পী-কারিগর শ্রেণির কর্মসংস্থান করা।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের অবসান করা।

৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা।

৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা।

১০. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা এবং সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য করা।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা।

১৩. ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল করা।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউসকে' বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা।

১৭. '৫২'-এর ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা।

১৯. ১৯৪০ -এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা।

২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপ নির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২রা এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তাঁরা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও তিনি অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল ও পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন

যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এ সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজতে থাকে যে কোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করতে। এমতাবস্থায় মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজি জুট মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ি করতে থাকে। একই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রোদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে ১৯৫৪ সালের ৩০এ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। এ শাসন ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। মাত্র ৫৬ দিনের শাসনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়। মূলত মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে কোন্দলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি।

একক কাজ ঃ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা চিহ্নিত কর।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উঠে। পূর্ব বাংলা থেকে এ দাবি ছিল আরও জোরালো। পূর্ব বাংলার জনদাবিই ছিল নতুন সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন অর্জিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইল। প্রথম অবস্থায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করা এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনীহায় গণপরিষদের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ কর্তৃক একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এ মূলনীতি কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ছিল নগণ্য। সময়ক্ষেপণ করে মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তার সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ উঠে এবং তারা কমিটির সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে যায়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত হয়। এবং এটি দুই বছর পর্যন্ত কার্যকরীছিল। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কার নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়?

ক. ড. কাজী মোতাহার হোসেন
খ. অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ. জনাব আবুল মনসুর আহমদ
ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

২. ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়-

i. ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য
ii. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তির জন্য
iii. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদ জানাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

টেলিভিশনে লোকজ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মিথিলা বেশ আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিল। কিন্তু, তার ছোট ভাই মিঠুন কেবলই চ্যানেল পরিবর্তন করে ইংরেজি কার্টুন দেখতে চেষ্টা করছিল। মিঠুনের মতে ঐসব গানের শ্রোতা হচ্ছে গ্রামের লোক। তার বোনের এসব গানপ্রীতি বেমানান লাগে।

৩. মিথিলা কোন্ আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত?

ক. অসহযোগ আন্দোলন
খ. খিলাফত আন্দোলন
গ. ভাষা আন্দোলন
ঘ. স্বাধিকার আন্দোলন

৪. উক্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিথিলা হতে পারেন-

i. দেশপ্রেমিক
ii. জাতীয়তাবাদী
iii. প্রতিবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবেলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট ছোট দল একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের উপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা চরমভাবে পরাজিত হন।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

খ. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গড়ে তোলা হয় কেন?

গ. সবুজনগর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না' –পাঠ্যপুস্তকে পঠিত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি অক্ষরে 'SHUVO JONMODIN' কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে 'HAPPY BIRTHDAY' আশা করেছিল।

ক. ১৯৪৮ সালের ২৪এ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন?

খ. ১৯৪৯ সালের পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়?

গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও।